PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-12, No.-1, May 2021

রমাপদ চৌধুরীর কলমে অধঃপতিত শিক্ষিত জীবনঃ "পরাজিত সম্রাট" উপন্যাস

রানু বিশ্বাস [1*]

[1*] সহঅধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, দ্বিজেন্দ্রলাল কলেজ, কৃষ্ণনগর।

সারসংক্ষেপ (Abstract)

রমাপদ চৌধুরী মধ্যবিত্তের অনুভূতির রূপকার। তিনি ষাটের দশকের তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের মিথ্যা আভিজাত্যকে প্রকাশ করেছেন তাঁর উপন্যাসগুলিতে। তাঁর উপন্যাসে বিষয়বস্তু পরিবর্তনের চেয়ে বেশী আকর্ষণ হল লেখকের অদ্ভূত পর্যবেক্ষণ শক্তি, তাঁর প্রয়োগ কৌশল ও মানসিকতার পরিবর্তন। শিক্ষিত মানুষের মধ্যে জন্মানো লোভ, হিংসা, রিরংসার রিপুগুলি সমাজকে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তার প্রতিচ্ছবি 'পরাজিত সম্রাট' উপন্যাসটি। স্বাধীনতার উত্তর মানুষের নাগরিক সমাজ জীবন কিভাবে দুর্নীতিপরায়ণ হয়েছিল, কিভাবে মানুষের মনোভাবকে পঙ্কিলে ডুবিয়েছিল --- তা তিনি তাঁর লেখনিতে তুলে ধরেছেন। বস্তুত রমাপদ চৌধুরীর চরিত্রগুলি নিজের স্বার্থে সমাজকে অবক্ষয় করেছে, ফলে তাঁদের জীবনকে ঘিরে ধরে শূন্যতা, নৈরাশ্য। উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে চরিত্রগুলি লোভের হাতছানিকে উপেক্ষা করতে পারে না, যে কারণে চরিত্রগুলি অবশেষে অতল গহ্বরে ডুবে যেতে থাকে। লেখক প্রথমে একটি অপরিচিত চরিত্রকে আমাদের সামনে ফুটিয়ে তোলেন, কিন্তু ক্রমশঃ সেই চরিত্রের সংলাপ ও আচরণ আমাদের কাছে খুব পরিচিত হয়ে ওঠে, আমরা তাদের মধ্যে আমাদের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পেয়ে বিস্মিত বোধ করি। চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি লেখক স্মৃতি ও বর্তমানের যোগসাজসে কাহিনি নির্মাণ করতে থাকেন। 'পরাজিত সম্রাট' এর নায়ক নিরুপম আমাদের প্রতিবেশী চরিত্র। উপন্যাসের শুরুতে পাঠক নিরুপমকে শ্রদ্ধা করে, সহানুভূতি দেখায়, অথচ উপন্যাসের শেষে সেই পাঠকই নিরুপমকে ঘৃণা করে, দয়া দেখায়। সমাজ বৃত্তে নিরুপমের এই পরিবর্তন আমাদের চমকে দেয় ঠিকই, কিন্তু একথা সত্য – ষাটের দশকে সরল সাধাসিধে বাঙালির এই বিবর্তন ঘটেছিল।

সূচক (Key word) : - রমাপদ চৌধুরী, নাগরিক জীবন, মধ্যবিত্ত, চরিত্র, অবক্ষয়, অবসাদ, অসহয়তা, ষাটের দশক, বাঙালির জীবন।

মূল আলোচনা (Discussion):

রমাপদ চৌধুরীর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে কলকাতা থেকে দূরে সদ্য গড়ে ওঠে একখন্ড শহর খড়গপুরকে ঘিরে। তিনি রেলের 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট' থেকে পাস করে, কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। কলকাতায় পড়াশোনা করতে এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃত কলেজ, হেয়ার স্কুল, দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং, সেনেট হল, বই পাড়া দেখে মুগ্ধ হন। সেই সময় কফি হাউস ছিল অ্যালবার্ট হল, ওই হলেই তিনি শুনেছিলেন সুভাষ চন্দ্রের বক্তৃতা আর পরবর্তীকালে সেনেট হলে শুনেছিলেন সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা। কৈশোর বয়সে তিনি গান্ধীজিকে একবার চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিলেন। হিজুলি রাজবন্ধিদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন গান্ধীজি, তখন গান্ধীজীর সাথে রমাপদদের সাক্ষাৎ হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাস করার পর প্রায় আট বছর তিনি বেকার

ছিলেন।। সেই সময় তিনি 'আজকাল' 'যুগান্তর' 'আনন্দবাজার', 'সচিত্র ভারত' পত্রিকায় গল্প লিখতে শুরু করেন। 'পূর্বাশা' পত্রিকায় একবার তাঁর পাঁচটি গল্প পরপর প্রকাশিত হয়েছিল যা পাঠক সমাজকে অভিভূত করেছিল! তিনি তার বন্ধুদের সঙ্গে সহযোগে দুটি পত্রিকা প্রকাশের কথা ভেবেছিলেন - প্রথমে 'ইদানিং' তারপর 'রমাপদ চৌধুরী পত্রিকা'। ঘটনাক্রমে 'ইদানিং' পত্রিকাটি দুই আড়াই বছর এবং 'রমাপদ চৌধুরী' পত্রিকাটি মাস ছয় মাসের অস্তিত্ব ছিল। ১৯৫২ সালের রমাপদ চৌধুরী আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান করেন তার পরের বছর তার প্রথম উপন্যাস 'প্রথম প্রহর' প্রকাশিত হয় সরাসরি বই হিসেবে। এই উপন্যাস লেখার সময় তিনি 'দরবারী' গল্পগ্রন্থ লেখেন যা শুধু পাঠকমহলকে নয়, বাংলা সাহিত্যমহলকে সমভাবে জনপ্রিয় করেছিল। এরপর থেকে প্রতিবছর পূজোয় রমাপদ চৌধুরী 'দেশ' সংখ্যায় উপন্যাস লিখতে শুরু করেন।

স্বাধীনতার পরবর্তী ষাট – সত্তর দশকে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনে একটা নিঃশব্দে পালাবদল ঘটে। সেইসময় বাঙালি অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের সাথে সাযূজ্য রেখে নিজের সামাজিক জীবনকে মেলাতে পারে না। ফলে মনের অন্তর গহনে একটি ব্যক্তিদ্বন্দ্ব তৈরি হয়, নাগরিক মূল্যবোধ ক্ষয় হতে থাকে। সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মনে ভালো মন্দ বোধ বিলুপ্তি পায়। চারিপাশের জগতে দ্রুততার সাথে সবকিছু পাল্টাতে থাকায়, ব্যক্তি অস্তিত্বের সংকটে পড়ে। এই ক্রমশঃ বদলে যাওয়া মানচিত্রটি লেখক রমাপদ চৌধুরী পর্যবেক্ষণ করেন আর সেই ঘটনাই তাঁর এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হয়েছে।

'পরাজিত সম্রাট' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় ১৩৭২ সালে(১৯৬৫)। পরে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। 'প্রসঙ্গ কথা'য় লেখক জানিয়েছেন, তিনি কোন সময় এই গ্রন্থ লেখেন: 'রোগশয্যায় ছ' মাস কাটিয়ে তখনও পুরোপুরি হয়ে উঠি নি।..... সাগরময় ঘোষ বললেন, পূজো সংখ্যা দেশ-এ উপন্যাস লিখতেই হবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হতে হ'ল। এ উপন্যাসের প্রথমে যে শিশুটি হারিয়ে গিয়েছিল, ভেবে রেখেছিলাম সে হারানো মেয়েই থেকে যাবে, তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু অসুস্থ লেখকের মনও হয়তো দূর্বল হয়ে পড়ে, সে চেষ্টা করেও নির্মম হতে পারে না। ফলে, শিশটিকে ফিরে পাওয়া গেল, এবং উপন্যাসের গন্তব্য গেল বদলে'।

উপন্যাসের শুরুতে আমরা দেখি, নিরুপম সৎ, নির্ভীক সরকারি কর্মচারি। বৃদ্ধ বাবা – মা সহ স্ত্রী মণীষা ও ছয় বছরের মেয়ে মীনুকে নিয়ে তাঁর এক ছোট্ট পরিবার ছিল। স্কুল মাস্টারের ছেলে নিরুপম কোনদিন অফিসে ঘুষ নেয়নি, চিরকাল সে স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছে। কিন্তু মেয়ে মীনু হারিয়ে যাবার পর আমরা দেখি, নিরুপমের চরিত্র বদলে গেছে। প্রথমদিকে সে থানা – বাড়ি – অফিসের ঘূর্ণিপাকে জড়িয়ে পরে। নিরুপম মেয়ের সম্পর্কে অজানা ভয়ে ভীত হত সবসময় – "মিন্টুর মত নিষ্পাপ একটি শিশুর জন্যে এমন একটা নরক অপেক্ষা করতে পারে এ-কথা ভাবতে গিয়েও মাথা ঝিমঝিম করে উঠেছে নিরপমের। ক্রোধে ঘুর্ণীয় জ্বলে উঠেছে ও মুহূর্তের জন্যে। ওর মনে হয়েছে, ওর হাতে তেমন শক্তি থাকলে এই সমাজকে নিরাপম ধ্বংস করে দিতো। নীতিবাদের ভন্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েই তৃপ্ত হতো না, যারা দিনের পর দিন এই নরক পিষে চলেছে, এই অকরণ বিষাক্ত বাষ্পের পৃথিবীকে যারা উচ্ছেদ করতে চায় না, পারে না, সমাজের সেই শক্তিধর উপরতলার মানুষগুলিকে ক্ষিপ্ত কুকুরের মত ছি'ড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে ইচ্ছে হলো নিরূপমের। অসহায় ক্রোধের জ্বালায় ওর মনে হলো, ও যদি একটি দিনের জন্যেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই আদিম বন্য মানুষের মত বীভৎস কঠিন কয়েক পাটি দাঁত

আর ধারালো বড় বড় নখ নিয়ে প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠতে পারতো!" (৩৪০ পৃঃ) নিরুপমের পিতৃহৃদয়ের হাহাকারের সাথে রমাপদ চৌধুরী এক আদর্শ মানুষের ক্ষোভকে বর্ণনা করেছেন।

অন্যদিকে যখন ইনেসপেক্টর মীনুকে খুঁজে পেলেন না, তখন নিরুপম নিজেই মীনুকে নিষিদ্ধ পল্লীতে খোঁজ শুরু করলেন। নিষিদ্ধপল্লীতে নিয়মিত যাওয়ার ফলে নিরূপম নিজের অজান্তেই ওই পাড়ার বাসিন্দা হয়ে যান। যে নিরুপম এককালে নিষিদ্ধ পল্লীর প্রতি বিরূপ ছিলেন, আমরা দেখি সেই নিরুপম প্রতিদিন অফিস ফেরত অবস্থায় নিত্য নতুন নারীর খোঁজে সেই পল্লীতে গমন করেন। উপন্যাসে ছোট মেয়ে মীনু হারিয়ে গেলেও, বাড়ি ফিরেছিল। কিন্তু সহজ সরল নিরুপম তার আগের সমাজ জীবনে ফিরতে পারেননি, কারণ ততদিনে নিরুপমের চরিত্রে বিবর্তন ঘটে। তার রক্ত এক বিষাক্ত নেশার দাস হয়ে ওঠে।

নিরুপমের এই অসৎ জীবনে একটুখানি মুক্তির বাতাস এনেছিল সুমিতা, তাঁর প্রথম জীবনের প্রেম। নিরুপমের প্রতিবেশী কাকুর কন্যা সুমিতা ছিল তাঁর ছোট বোন বাণীর বন্ধু। সেইসূত্রে দু বাড়ির ছেলেমেয়েরা অবাধে মেলামেশার সুযোগে পেতেন, কিন্তু সুমিতার আনন্দময়ীর চোখে 'প্রেম' ছিল নিষিদ্ধ বস্তু। রমাপদ চৌধুরী এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন, সমকালীন বাঙালীর প্রাচীন ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্থান থেকে আগত ব্যক্তিদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, এই দেশের অবস্থার সাথে মানিয়ে নিলেও তাঁরা জাত – বর্ণের বাইরে নিজ সন্তানের বৈবাহিক সম্পর্ক মানতে নারাজ ছিল। সুমিতার মায়ের মধ্যেও এই প্রভাব ছিল "চাঁপামাটির দু'জাতের দুটি ছেলেমেয়ে একবার পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল। খবর শুনে আঁতকে উঠেছিলেন" আনন্দময়ী। তাই তিনি সুমিতার সাথে নিরুপমের বিবাহ না দিয়ে স্বজাতীর ছেলে শ্রীনাথের সাথে মেয়ের বিয়ে দেন। এই শ্রীনাথ সারাদিন জুয়া খেলে, মদ খেয়ে জীবন যাপন কাটায়, ব্যভিচারী জীবনের জন্য সে সুমিতার গয়না বিক্রি করে। অবশেষে সংসারের প্রয়োজনে সুমিতাকে চায়ের দোকানে কাজ করতে পাঠায় শ্রীনাথ। সেখানে দোকানের মালিক সুমিতার গায়ে হাত দেওয়ায় শ্রীনাথ প্রতিবাদের করেননি, বরং বলে "আরে বাবা পুরুষমানুষকে কাজ করতে গিয়ে গালাগালি খেতে হয় কখনো কখনো। মেয়েমানুষদের নয় স্রেফ একটু আদর করে।" (৩৯৬ পৃঃ) স্বামীর এই কুরুচি রসিকতা শুনে সুমিতা সংসার ত্যাগ করে চলে আসে।

সুমিতা তাঁর জীবনের প্রথম প্রেম নিরুপমকে পায়নি, অন্যদিকে স্বামী পেলেও তাঁর প্রেম পায়নি। এই হতভাগ্য জীবনে আরেক বাধা আর্থিক দুর্গতি – "এই অসুখী ঘরখানা , এই শীর্ণ গলি, এই দারিদ্র্যের হাওয়া থেকে মুক্তি পেতে চায় সুমিতা"। (৩৯৩ পৃঃ) ষাটের দশকে শিক্ষিত বেকার ছিল সীমাতিত, বাধ্য হয়েই সামান্য কয়েকটি টাকার বিনিময়ে সুমিতা হয়ে যায় নিষিদ্ধ পল্লীর বাসিন্দা। প্রায়ই সন্ধ্যাবেলায়, সে নাটকের মহড়া দিতে যায় – এই নাটকের মহড়া আসলে সুমিতার জীবনে এক ছদ্মবেশ। পাড়া প্রতিবেশিদের কৌতূহল মেটানোর জন্য সে থিয়েটারের আড়ালে নিজেকে হোটেলের রক্ষিতা রাখে। তাঁর বাবা মা জানে, সুমিতা থিয়েটারের টাকায় সংসার চালায়। অন্যদিকে মীনুকে হারানোর পর নিরুপমকে নিষিদ্ধ পল্লী থেকে নতুন জীবনে ফেরানোর উদ্দেশ্যে জ্ঞানবাবু একপ্রকার জোর করেই তাঁকে নাটকের মহড়ায় আনেন, সেখানেই নিরুপম ও সুমিতার পুনরায় দেখা হয়।

জীবন যুদ্ধে পরাজিত দুই মানুষ সুমিতা ও নিরুপম আবার পরস্পরের সন্নিকটে আসে। তাঁরা তাঁদের পুরনো ইতিহাস নিয়ে বিভোর থাকে, কিন্তু তাঁদের অজানা থাকে বর্তমান পঙ্কিল ইতিহাস। উপন্যাসের

শুরুতে যে নিরুপম ঘুষকে ঘৃণার চোখে দেখতেন, পরবর্তীকালে সেই মানুষ সন্ধ্যার উত্তেজনার মূল্য দেওয়ার জন্য ঘুষ নিতে থাকে। স্ত্রী মনীষার সাথে বহুদিন আগেই দাম্পত্য সম্পর্ক নিভে যায়, এখন প্রতি সন্ধ্যাবেলায় অফিস ফেরত নিরুপম নিত্য নতুন নারী শরীরের খোঁজে হোটেলের দ্বারস্ত হয়। আর খুব সহজেই একদিন এক নতুন শরীরের খোঁজে সে যে রুমে যায়, সেখানে আগে থেকেই সুমিতা তাঁর নতুন খরিদ্দারের খোঁজে অপেক্ষামান ছিল। লেখক উপন্যাসে এক বিশ্বাস, এক বিশ্বস্ত প্রেমের অপমৃত্যু দেখায়। একটি মাত্র খাঁটি সম্পর্ক ছিল সুমিতার জীবনে, আজ তা কাঁচের মতই ভঙ্গুর হয়ে যায়। প্রচন্ড আক্রোশে সুমিতার " চোখের দৃষ্টি যেন স্তম্ভিত আহত একটি কণ্ঠের ধিক্কার হয়ে বলে উঠলো বারবার – ছি ছি তুমি!" (৪৩২ পৃঃ) অন্যদিকে নিরুপম স্থবির হয়ে যায় – "পা থেমে গিয়েছিল নিরুপমের। ওর চোখ নেশা হারিয়েছে। জীবন হারিয়েছে একমাত্র স্বপ্ন, একমাত্র বিশ্বাস"।(৪৩৩ পৃঃ) এই প্রথম ভাগ্যের পরিহাসে সে পরাজিত সৈনিক। সুমিতাকে বিয়ে না করেও তাঁর মাথা উঁচু ছিল, কন্যা হারানোর সময় ভগ্ন হৃদয়ে সে স্থির ছিল, ঘুষ নেওয়ার সময়ও তাঁর মন শক্ত ছিল। কিন্তু আজ সে জীবনে সবচেয়ে বেশী ঠকে গেছে। নিয়তির অভিশাপে এতদিন তাঁর মন ঢাকা ছিল এক মিথ্যা সম্পর্কের আবরণে --- ভাগ্যের এই বিশ্বাসঘাতকতাতে সে মূহ্যমান হয়ে যায়। তারপর সুমিতার প্রতি ঘৃণায় বলে ওঠে "ছি ছি, সুমিতা তুমি!"। এই ঘৃণা বুমেরাং হয়ে তাঁর কাছেই ফিরে আসে। রমাপদ চৌধুরী নিরুপমের কাহিনীর মধ্য দিয়ে ষাটের দশকে বাঙালীর তলিয়ে যাওয়ার ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। নিরুপম ও সুমিতা হয়ে ওঠে ষাটের দশকে অনুভূতিহীন বাঙালী প্রতীক চরিত্র।

রমাপদ চৌধুরী উপন্যাসে দেখিয়েছেন, এক সৎ মানুষ কিভাবে পরিবেশ পরিস্থিতির প্রভাবে অন্যায়, পঙ্কিল জীবনে অধিকারী হন। স্বাধীনতার পূর্বে যে বাঙালি দেশের স্বার্থে আদর্শবান ছিল, স্বাধীনতার ১০ বছর পরে সেই শিক্ষিত বাঙালী আদর্শচ্যুত হয়। অন্তঃসারশূণ্য এই বাঙালি চরম স্বার্থপর, নিরুপম একবারও স্ত্রী মনীষার কথা ভাবেননি, সন্তান হারিয়ে জন্য সে যে কারণে ভীত ছিল – আজ সমাজের একজন দ্বায়িত্ববান নাগরিক হয়ে নিজে ওই কলুষিত জীবনকে অঙ্গীকার করেছেন। নিজেকে স্বান্ত্বনা দিয়ে সে বলেছে "দুঃখের পৃথিবী থেকে নিঃসঙ্গতা থেকে ও শুধু পরিত্রাণ চেয়েছে"। (৩৮০ পৃঃ) অথচ সেই নিরুপমের স্কুল মাস্টার বাবা তাঁকে বলেছিল "পুলিশ কি করবে, গবর্নমেন্ট কি করবে। রিয়েল কালপিট তো সমাজ, সমাজের মানুষগুলোই" (৪০২ পৃঃ), অর্থাৎ সমাজের নিজস্ব বিবেক না থাকলে এই অন্যায় কোনদিনই বন্ধ হবে না। এই অন্যায় জীবনে নিরুপমের সবচেয়ে বড়ো সঙ্গী ছিল অফিস কলিগ অরুণ বক্সি। সমাজ সম্পর্কে তাঁর মতামত হল "...ওরা আসে সহজে টাকা মেলে, তাই। আর আমরা কটা টাকা দিলেই সুখ পাই...সমাজ? সংসার?.....ফুঃ। সারা পৃথিবী ছেয়ে যাবে...। ফান অ্যান্ড মানি।"(৪২৮ পৃঃ)

পঞ্চাশ দশকে স্বাধীন ভারতবর্ষে এক নৈরাজ্যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ষাটের দশকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্যাংক জাতীয়করণ হলেও অনেক কর্মী ছাঁটাই হয়েছিল। ফলে মধ্যবিত্ত জীবনের দারিদ্রতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। সরকারি অফিসগুলোতে কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে মানুষের জীবন প্রণালী আধুনিকতার হাতছানিতে লুব্ধ হয়। ফলে বিনা পরিশ্রমে অর্থ রোজগারের আশায় নারী-পুরুষ উভয় অসৎ জীবনে পা বাড়ায়। মানুষের সনাতন বুদ্ধিবৃত্তি স্থান দখল করে নিয়েছিল লালসা ও কামনা, সামান্য সুখের আশায় মানুষ অন্ধকার দুনিয়ায় হারিয়ে যায়। অন্ধকারে

ও লোভের পঙ্কিলতার পরে মানুষ অনেক সময় মিথ্যে জীবনটাকে সত্য বলে মনে করেন। যখন সেই বোধ ফিরে আসে, তখন মানুষটি হয় জীবন যুদ্ধে পরাজিত সৈনিক।

আজও বিশ্বায়ন পৃথিবীতে এই অন্যায় বন্ধ তো হয়নি, বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। বিবেকবান মানুষ আজ অচল। উপন্যাসে আমরা দেখি, নিরুপমের বাবা ও নিরুপমের অফিস কলিগ জ্ঞানবাবু আজ অসহায়ভাবে নিরুপম, অরুণকে শুধু লক্ষ্য। তাঁরা জানে, বিবেক আজ অচল -- "ও বস্তুটা সভ্যতার শরীরে একটা অর্থহীন আপেন্ডিসসাইটিস"। (৩৮৪) নিরুপমের অধঃপতন দেখে জ্ঞানবাবু মনে হয় " এতদিন এক একটা বিশ্বাস নিয়ে মানুষ বাঁচতো, আজ এক একটা পাপ—এক একটা অন্যায় যেন প্রতিটি মানষের সঙ্গী হতে চাইছে। অবিশ্বাস তার সঙ্গী"।(৩৮৩) 'পরাজিত সম্রাট' উপন্যাসে লেখক আধুনিক পৃথিবীর জটিল সমস্যাকে রূপায়িত করেছেন। সমকালীন যুগে বিজ্ঞানের প্রভাবে মানুষের জীবনশৈলী সম্রাটের মত উচ্চ পর্যায় হলেও, মানব চেতনায় সে কিন্তু পরাজিত।

রমাপদ চৌধুরী এই উপন্যাসে নাগরিক জীবনের জটিলতাকে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণাকে অন্য এক চেতনাস্রোত দিয়ে ধরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের অবসাদ, ক্রোধ, ভালবাসা, ভালবাসাহীনতা, জীবনযাপনের অসহায়তা, চাওয়া-পাওয়ার শাশ্বত হিসেব-নিকেশকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। ছোট ছোট বাক্য, কথনভঙ্গি, গদ্যভাষা, বাস্তবজগতের বহু তথ্য সমাবেশ ঘটিয়ে উপন্যাসে নাটকীয়তা শৈলী নির্মাণ করেছেন। তিনি মানুষের অনভূতির মাঝখানে জগত ও জীবনের মূল ছন্দটি অনুভব করার চেষ্টা করেছেন আর এখানেই উপন্যাসটি স্বাধীনতার প্রাককালে শিক্ষিত মানুষের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়েছে।

তথ্যপঞ্জী (Refference):

1. চট্টোপাধ্যায় হীরেন, সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য, 'রমাপদ চৌধুরী, পুনর্নির্মাণ, নিজেকেই', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৪২০, পৃষ্ঠা – ২৬৭-২৭৬।
2. সেনগুপ্ত বরুণ (সম্পাদক), 'শশাঙ্কশেখর, হিরণ্ময় এবং রমাপদ চৌধুরী', সাপ্তাহিক বর্তমান, ২১ অক্টোবর, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা – ১১৭।
3. চৌধুরী রমাপদ, উপন্যাস সমগ্র, খন্ড ১, 'পরাজিত সম্রাট' উপন্যাস, নবম মুদ্রণ মার্চ, ২০১৫, পৃষ্ঠা – ৩৩৫-৪৪২ ।
4. 'রমাপদ চৌধুরী'(১৯২২ - ২০১৮) , দেশ সংখ্যা, ২ আগস্ট, ২০১৮, পৃষ্ঠা – ১৬ – ২৪।
5. 'জনমত – জনমত, বৃহস্পতিবার ১৮ মে, ১৯৮৯ থেকে পুনঃ মুদ্রিত।
6. চক্রবর্তী কাকলি, 'এতদিনে সাহিত্য অকাডেমি পেলেন রমাপদ চৌধুরী', বর্তমান, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা – ১৯।